



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.104-112

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

সনাতন হিন্দুধর্ম ও বঙ্কিমচন্দ্র: একটি সমীক্ষা

অতসী মহাপাত্র

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894) was a novelist, writer, early Hindu nationalist, Philosopher, Social reformer, and had a unique identity in 19th century. He was essentially a religious Philosopher who synthesized a portion of Hindu great traditions with the metaphysical concerns. He considers a Hindu fundamentalist by a section of Hindu and Muslim intellectuals. He was certainly a devout Hindu by birth, but he did not write any religious treatise. Krishna as depicted in Krishna Charita is not a Hindu god. He presents a concept – that of an ideal human being who is largely secular. Dharmatatwa is Bankim's logical interpretation of Hindu religion. Anushilan tatwa, Anandamath and others writings of Bankim Chandra are also secular. He was not interested in an exclusively religion or spiritual, view on Hinduism, reduce from its culture and Social matrix. Based on a more differentiated and complex view of nature of religion, he criticized on one hand the excesses of past oriented Indian reformers and, on the others hand, the idealizations of Indian thought by European orientalist. A District magistrate by profession, he had to opportunity to interact with utilitarian stalwarts like Bentham and Mill. He was also attracted towards the secular morality of the western variety. He applies Mill's inductively designed scientific method to prove that God (Iswar) is the creator. He is also the designer and keeper of dharma law. But more important, he has emerged as an avatara (God in human form) to conserve this morally sanctioned law. Krishna avatar received disproportionate significance in Bankim's religious Philosophy. In his Philosophy he adjusted different varieties of utilitarianism like perfectionism, humanism and positivism. This paper focuses on Bankim chandra's conception on new structure or form of Hinduism which can rightly be described as 'New Hinduism'.

Keywords: Bankimchandra, Dharmatatwa, Hinduism, Humanism, Religious Philosophy

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) হলেন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মনীষী, বিশিষ্ট বাঙালী ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক। তিনি ১৮৩৮ সালে ২৭শে জুন উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলেন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা হলেন দুর্গাসুন্দরী দেবী। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছাত্রজীবন কেটে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়ে। তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের মধ্য দিয়েই। রুচি-উদ্যম-নীতি জ্ঞান-মনীষা সব দিক থেকেই তিনি খাঁটি ইংরেজ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তিনি একসময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি পদে চাকরি করেন। কর্মক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ, নিষ্ঠীক, কর্তব্যপরায়ণ, সুযোগ্য শাসক ও বিচারক ছিলেন। তাঁর

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১৮৯১ সালে “রায়বাহাদুর” এবং ১৮৯০ সালে “Companion of the most Eminent order of Indian Empire” (CMEIOE) উপাধি প্রদান করেন। সারাজীবন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তবে লেখক ও পুনর্জাগরণের দার্শনিক হিসাবে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সাহিত্য সম্রাট হিসাবে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে অসীম অবদানের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেন। শ্রীমদভগবৎগীতার ব্যাখ্যাতা হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর চিন্তাভাবনা একদিকে গোঁড়া রক্ষণশীল ও আধুনিক দুই ধরনের চিন্তাবিদদের এক বড় অংশকে আকৃষ্ট করেছিল।

জনপ্রশাসক হিসাবে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার তাঁদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকেও ধরে রেখেছিলেন, যে সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল সংস্কৃত শিক্ষা, বাঙালিয়ানা, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং নিকাম কর্মের সুমহান হিন্দু আদর্শ। তিনি সনাতন সংস্কৃত ও আধুনিক ইংরেজি একই সঙ্গে উভয় শিক্ষা লাভ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি সনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত বাংলা ভাষায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদী সাহিত্য ও মহাকাব্য পাঠ করেছিলেন। প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সনাতন ধর্ম বিরোধী কটর বিজ্ঞানবাদী বঙ্কিমচন্দ্র মিলের (J.S. Mill), বস্তুবাদী দর্শন, কোমৎ (Comte) এর প্রত্যক্ষবাদী দর্শন, রুশোর (Jean Jacques Rousseau) সাম্যবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি নিজস্ব মেধা পরিশ্রম ও সদচ্ছার বলে তিনি হয়ে উঠেছেন একজন দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী। একইসঙ্গে তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, ধ্রুপদী সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। রেনেসাঁসের যুগে পরিপূর্ণ মানুষের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই যুগে একদিকে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য, অন্যদিকে ইউরোপীয় আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও যুক্তির পারস্পরিক মেলবন্ধনে প্রয়াসী হন। পশ্চিমী শিক্ষার আলোয় আলোকিত বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, উদারনীতিবাদ, দৃষ্টবাদ, হিতবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর মতে ইতিহাসের গতি সর্বদাই একমুখী, যা সবসময় উন্নতির দিকে ক্রমবর্ধমান। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ, নৈব্যক্তিক আইন প্রতিষ্ঠা, নীচু জাতির মানুষের অধিক সুবিধা প্রদান, আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন, এমনকি মুক্ত বাণিজ্যের অর্থনীতি চালু করার মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজিক প্রগতির শর্তাবলীকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ভারতের নিজস্বতা, স্বকীয়তা, আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার উপর বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উনিশ শতকের নবজাগরণের পর্যায়ের চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রজন্ম স্নাতকই নন, তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে সমানভাবে আগ্রহী। তিনি উনবিংশ শতকের কুসংস্কারাছন্ন বাঙ্গালী তথা ভারতীয় সমাজকে কশাঘাত করেছেন। তিনি তাঁর বহু প্রবন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সাবলীল ভাষার মাধ্যমে সমকালীন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান গবেষণার নানা দিক, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সর্বশেষ আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে স্বদেশবাসীদের অবহিত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বসমূহকে সহজ ও সরল করে জনমানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি আত্মস্থ করার পাশাপাশি সেগুলিকে তিনি রসাত্মকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিচক্ষণতার পরিচয় দান করেছেন। কোন গুরুগম্ভীর আলোচনার দ্বারা পাঠক হৃদয় ভারাক্রান্ত না করে সাধারণ মানুষের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করেছেন। এই সব ক্ষেত্রে তাঁর নিজ আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা এবং দেশবাসীকে তা জানানোর আগ্রহ ছিল অসাধারণ। শুধু তাই নয়, দুরূহ গাণিতিক প্রক্রিয়াকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত করার প্রয়াস ও পটুতাও দেশবাসীর কাছে চিরবিস্ময়কর। গোপাল হালদার বর্তমান কালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন - “To this day we are drawn to him on the hand by his rationality, modernism and abiding contemporaneity and on the other by his classical presentation.”^২

প্রতিটি যুগেই জীবনের মূল্যমান নিয়ে এক একটি আদর্শ গড়ে ওঠে। মনীষার পরিমাপ করা সম্ভব হয় এই আদর্শের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি সম্ভার নতুন প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বাস্তব জীবনের উপর ভিত্তি করে, যা কেবলমাত্র নিছক তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা মানুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তাঁর রচনার দুটি পর্যায় আছে। প্রথম দিকের রচনায় উপন্যাস, প্রবন্ধ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, গীতার ব্যাখ্যা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে ধর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসুক ছিলেন না, পরের দিকে সেই বিষয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। এই নতুন উৎসাহের মূলে রয়েছে সেই একই জীবন জিজ্ঞাসা, যা তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস ও প্রবন্ধের মূলে ছিল; অর্থাৎ সেই জীবন বা অস্তিত্বকে বোঝবার আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ভিত্তি করে এই জীবনকে জানতে

চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই জানার মধ্য দিয়ে তিনি তৃপ্তিলাভ করতে সমর্থ হন নি; কারণ এর দ্বারা কেবলমাত্র জীবন সম্পর্কে বাহ্যিক রূপের জ্ঞান লাভ করা যায়। ধর্মতত্ত্বে তিনি জীবনের অন্তরঙ্গ দিকটির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘কৃষ্ণচরিত’, ‘শ্রীমদভগবৎগীতা’ নামে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সাহিত্য জীবনের শেষ দিকে তিনি সৃজনশীল সাহিত্য চর্চার থেকে সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উৎঘাটনের ক্ষেত্রেই বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন। আনন্দমঠ (১৮৮২) এবং দেবী চৌধুরাণী (১৮৮২) গ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্রে ও গীতার ভাষ্যে তা পরিষ্ফুট হয়েছে। ‘শ্রীকৃষ্ণ হলেন আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র’ – এই ধারণা তাঁর রচিত নানান রচনাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ধারণা জনমানসে প্রোথিত হয়ে রয়েছে তা হল বঙ্কিমচন্দ্র অতি গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী, তাঁর মূল্যবোধ অতীতশ্রয়ী, সেকেলে, প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি হিন্দুধর্মের সমর্থনে তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এরূপ ধারণা বহু দিন যাবৎ প্রচলিত থাকলেও আনন্দমঠের পাঠান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিতর্ক বিস্তৃত ও বহু প্রসারিত হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে উথিত এরূপ অভিযোগ নিতান্তই একদেশদর্শী, ঐকান্তিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া হিন্দু প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করা তাঁকে অতি সরলীকরণের প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতা, বিচক্ষণতা, গ্রহণশক্তি, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল অতীত দূরদর্শিতার পরিচায়ক, যা সকল সাধারণ মানুষের সমীকরণের উর্দে অবস্থিত। আবার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে আধুনিক প্রগতিশীল লেখকরা মূলত অভিযোগ করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একাধিক লেখায় প্রাচীন ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানবাদী পজিটিভিজমের নিরীখে প্রাচীন হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করতে আগ্রহী ছিলেন। তবে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনায় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অসারতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। সেজন্য নিজের ভাবমূর্তি ও মননশীলতার বিপরীতে গিয়ে তিনি ‘কত কাল মনুষ্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, “বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে।”^২ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে তিনি এই ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না। বিচার বিযুক্তবাদী মনোভাব বর্জন করে যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তার মধ্য দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের কাল্পনিকতা, আবেগময়তার দিকগুলির অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। Tapan Roychoudhury তাঁর “Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteen Century Bengal”^৩ গ্রন্থে দেখিয়েছেন মিল, বেঙ্হাম ও কো্যাং এর প্রভাবে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) হিন্দুধর্ম ও ভারতের সনাতন ব্যবস্থার যুক্তিপূর্ণ ও কঠোর সমালোচনা করেছেন। বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির কিছু কাল্পনিক কাহিনীকে যেভাবে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তারই প্রতিবাদ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ‘গগন পর্যটন’ নামক প্রবন্ধের সূচনায় নির্মম প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন- “পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাগণ আকাশ মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন; কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডু করিয়া ফেলিতেন, কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।”^৪ আবার ‘কৃষ্ণচরিত্র’ নিবন্ধে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন- যেমন, “হরিনাম সংকীর্ণন কালে একদিকে বৈষ্ণবরা খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর একদিকে নব্য শিক্ষিতেরা ‘Nuissance!’ বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে মাটিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়ন, তেমনি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থের নাম মাত্রে একদল মাটিতে গড়াগড়ি দেন.....ভূসি গুনিয়া ভক্তিরসে দেশ প্লাবিত করেন, আর একদল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য, উপহাস্যপ্রদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহার নাই..... দুঃখের উপর দুঃখ এই কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।”^৫ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ভারতের জাতীয় অধোগতির মূল কারণ ছিল তৎকালীন হিন্দুধর্ম ও জীবন সম্পর্কে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি।

১৮৭১ সালে তিনি হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বিপুল ভ্রান্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। গৌতম বুদ্ধ বেদের অভ্রান্ততা, জাতপাত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রভৃতি হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন হিন্দু দর্শন পক্ষাঘাতযুক্ত হয়েছে তার অবরোহমূলক পদ্ধতির জন্য (Deductive Method)। হিন্দুরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা - নিরীক্ষাকে কোন রকম বৌদ্ধিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করেন না। ফলে বিচার বিশ্লেষণমূলক সাম্যনীতির

পরিবর্তে হিন্দু দর্শনে উদ্ভট ও কাল্পনিক সিদ্ধান্ত সমূহ নিঃসৃত হয়। ফলে এক্ষেত্রে হিন্দুদর্শনে জ্ঞানশাস্ত্রের যুক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে পুরাণ কথা বা অতিকথা (Myth) ভিত্তিক ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, হিন্দুদের এরূপ বিশ্ববীক্ষার (World view) জন্যই ভারতীয়রা হয়ে উঠেছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং পার্থিব বিষয়ে উদাসীন। তাই নিজ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি বিকল্প পথের কথা বলেছেন: “এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা।”^৬ কিন্তু হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বর্জন বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত নয়। পৃথিবীতে এ যাবৎ প্রচলিত প্রধান ধর্মমতের অন্য কোনটিকেই তিনি হিন্দুধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন না; এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মের বর্জনকে তিনি মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করেন না। তাই পাদটীকায় তিনি বলেছেন – “অনেকে বলেন যে, ধর্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিশাস্ত্র অবলম্বন করিলে সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে..... এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম ছাড়িয়া, কেবলমাত্র নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন তাহা বাস্তবিক ধর্ম বা ধর্মমূলক।”^৭

বঙ্কিমচন্দ্র সকল প্রকার গোঁড়ামি, কুসংস্কার এমনকি যে ধর্মশাস্ত্রগুলি হিন্দুত্বের পক্ষে কথা বলে দাবি করে সেই ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও তিনি শেষ অবধি অস্বীকার করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং যুক্তিসংগত ভিত্তির উপর ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের পুনঃস্থাপন। ১৮৮০ এর দশক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম ও দর্শনের উপর নানান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র পরামর্শ প্রদান করে বলেছেন- “যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত।যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে..... যাহা কেবল শুভ এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থ সাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে এবং অজ্ঞ ও নির্বোধগণ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে.....যে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে।”^৮ বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই উপলব্ধি করেন যে ধর্মের এই ‘সারভাগ’ সকল প্রকার ধর্মের ক্ষেত্রে তথা সকল ধার্মিক মানুষের পক্ষে হিতসাধনকারী। স্পষ্টতই অপর ধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন মৌলিক বিরূপতা নেই। এই সার অংশ ব্যতীত বাকি সবকিছুই অসার এবং সেই কারণে তা পরিত্যাজ্য। তাঁর ভাষায় বলা যায় – “শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক – তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে তবু অসত্য অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।”^৯ তবে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তাঁর বক্তব্য তথাকথিত প্রাচীন (রক্ষণশীল) পন্থীরা করবেন না। বেদাদি শাস্ত্রে কোন অধর্ম বা অসত্য কথা থাকতে পারে – এমন কথা তারা সমর্থন করবেন না। সেজন্য তিনি সর্গর্বে ঘোষণা করেছেন, “এই সম্প্রদায়ের জন্য আমি লিখিতেছি না।”^{১০} এইভাবে বঙ্কিম ভাবনায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হয় নি। বরং তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নূতন জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ করে সূস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিনির্ভরতার উদাহরণ হিসাবে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় আণ্ডবাক্যে আত্মাকে ক্ষতিকর বলে ঘোষণা করা। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পরে ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ শিরোনাম সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ‘জ্ঞান’(Cognitive act) বিষয়ক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানের ভিত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আণ্ডবাক্যকে (বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্যকে) জ্ঞানের একটি ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা মুক্ত, যথার্থ জ্ঞান প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির বাক্য বিশেষ হল আণ্ডবাক্য। বৈদিকশাস্ত্র ও মুনিঋষিদের বাক্য থেকে জ্ঞাত যে জ্ঞান তাই হল আণ্ডবাক্য। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যৌক্তিক বিশ্লেষণ অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত না হলে, শুধুমাত্র প্রাচীনত্ব গুণে অথবা ঋষিবাক্য এই কারণে কোন কিছুকে জ্ঞানের ভিত্তি বলে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মতামত গ্রহণ করা ভারতবর্ষের অবনতির যে একটা কারণ, ইহা বলা বাহুল্য।দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।”^{১১} শুধু তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় দর্শনকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, “দার্শনিকরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন ক হইতে খ হইয়াছে, গ এর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন না। কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখনো প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভালো, তথাপি দর্শন মানিব না।”^{১২} প্রত্যক্ষভিত্তিক ও পরোক্ষভিত্তিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের পাশে ভারতীয় চার্বাক দর্শনকে রেখেছেন, ঠিক যেমন কান্টের idealism (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আভ্যন্তরীণ মত) এর পাশে বেদান্তের উল্লেখ করেছেন।

‘জ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এ দুটিকে একই জিজ্ঞাসার, একই অনুসন্ধানের দুটি পৃথক মার্গ বা পথ বলে উল্লেখ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হল জীবন যে দুঃখময় এ থেকে নিস্তারের উপায় কি? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন “ ইহার দুই উত্তর আছে। এক ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়রা বলেন, প্রকৃতি জেয়, যাহাতে প্রকৃতি জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ.....প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর, সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দেবেন, প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ণ কর, - প্রকৃতির গুণ্ড তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল - ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র। ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয় - যতদিন প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন দুঃখ থাকিবে। অতএব, প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।”^{১৩}

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় ধর্মালোচনা করেছিলেন সে সময় দেশে পৌরাণিক ও বৈষ্ণব ধর্মের পুনর্জাগরণ হয়েছিল। সমসাময়িককালে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের খুবই শ্রদ্ধা ছিল - ধর্মতত্ত্বে কেশবচন্দ্রকে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য নেতাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন নি। বরং ব্রাহ্ম নেতাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। তবে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামী, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখদের সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। সমকালীন ব্রাহ্মধর্মের থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মালোচনা অনেক বেশি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। তবে বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বকে ব্রাহ্মধর্মের নামান্তর বলে অভিহিত করেছেন। সমসাময়িক হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ একটা যোগ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর ধর্মতত্ত্ব কিংবা কৃষ্ণচরিত্র থেকে ধারণা করা যাতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকখানি বিজ্ঞানবাদী মনোভাব থেকে সরে এসে সংকীর্ণ ব্রাহ্মণবাদী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। সকল ধর্মীয় আন্দোলন এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নি। তাঁর সৃষ্ট ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র এবং গীতার অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পড়লে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আসলে হিন্দুধর্ম নয়, তাকে বলা যায় মানবধর্ম। মানুষের সবগুলি বৃত্তির সুসামঞ্জস্য বিকাশ এই ধর্মের উদ্দিষ্ট, যদিও লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর।”^{১৪}

বঙ্কিমচন্দ্র মানব মনের বৃত্তিগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেন - জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, ও কার্যকারিণী বৃত্তি। এই কার্যকারিণী বৃত্তি ব্যতীত বাকি অপর দুটি বৃত্তি তথা জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির উপজীব্য হল প্রত্যক্ষ ও অনুমান, আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন হয় অনুভবের সাহায্যে এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিই সুন্দরের উপাসনা করে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জড়পিণ্ডের সমষ্টি মাত্র নয়, এর অন্তরালে এক অনির্বচনীয় শৃঙ্খলা রয়েছে, রয়েছে এক অপ্রত্যক্ষগোচর শক্তি, যাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য নামে অভিহিত করা হয়। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবের অন্তঃপ্রকৃতিতে। যা আছে তা সং, তার অন্তরালে রয়েছে চিং বা চেতনা এবং তারই ফল হল আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দের অনুভূতিই হল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির বিশেষ ক্ষেত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাহিত্যে তিনি বিশ্বের বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যের উপস্থিতি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ জগতে রূপের যে প্রকাশ হয় তার খন্ডতা, সংকীর্ণতা, অস্পষ্টতা অতিক্রম করে অব্যক্ত উন্নত ভাবের রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। ভিন্ন ভাষায় বলা যায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের অপরূপ সমন্বয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র সেন বলেছেন - “নিয়তির সঙ্গে মানবপ্রবৃত্তির ঐক্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন কল্পনার সাহায্যে। ইহার পর তিনি বুদ্ধি দিয়া এক ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন, যাহাতে বিচার বিবেচনাসহীন নিয়তির নিষ্ঠুরতা পরিত্যক্ত হইল। তাহার ভগবৎ ভক্তি দৃঢ় হইল। তিনি জ্ঞান, নিকাম কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন।”^{১৫}

প্রকৃতপক্ষে, অন্ধ আনুগত্য, কটর গোঁড়ামি হল বঙ্কিম মনের স্বভাব বিরোধী। শ্রদ্ধা এবং যুক্তি, ভক্তি এবং বিচার হল বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মভাবনার প্রধান লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধে বলেছেন - “অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, এ জীবন লইয়া কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি,.....যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি.....এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই.....তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি।”^{১৬} তবে বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র যে ভক্তিবাদী চিন্তাবিদ ছিলেন এমন কথা যায় না। তাঁর মনে নিরীশ্বরবাদী কোমৎ এর দর্শন গভীরভাবে রাখাপাত করেছিল। পরলোক

সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। এককথায় বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নিকাম কর্ম ও ভক্তিতত্ত্ব এবং নিরীশ্বরবাদী কোমৎ এর দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আবার কখনো তিনি অতি সরল ভাষায় একান্ত আন্তরিক উক্তি করেছেন যে, “প্রকৃত ধর্ম, যা সত্য, সেই ধর্মের মূর্তি বড়ো মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন - প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে আপনার উন্নতিসাধন। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, শান্তি - এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল - তাহার মোহিনী মূর্তি অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?”^{১৭} ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি হল মনের বিভিন্ন অবস্থা। ‘চিত্তশুদ্ধি’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দমনে মনের পবিত্রতা অর্জনকে হিন্দু ধর্মের সার বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু হিন্দু ধর্মেরই নয়, গভীর উপলব্ধি জাত যে কোন ধর্ম, যে কোন বিশ্বাসের এইটি অন্তঃস্থ সার। তাঁর ভাষায় বলা যায় “চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মের সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার, খ্রীষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলাম ধর্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎ ধর্মের সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ পজ্জিটিভিস্ট।”^{১৮} এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নানা ধর্মকে সমভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি ধর্মের উৎস ও বিকাশ - বিশ্লেষণ যেভাবে করেছেন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই।

তবে, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান যুক্তি হল হিন্দুধর্মের সার সকল সম্প্রদায়ের উর্দে, সকল ধর্মাবলম্বীর কাছে গ্রহণযোগ্য। ভগবৎগীতার আত্মার অবিনাশীতার কথা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এইটি হিন্দুধর্মের ‘প্রধান তত্ত্ব’ আর এটি সকল ধর্মেরও মূল অবলম্বন। তাঁর ভাষায় বলা যায় - “কেবল হিন্দুধর্মের নহে, খ্রীষ্টধর্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইসলামধর্মের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয় তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে ও ইহাতে পারে কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন এবং তিনি বিনাশশূন্য, অমর ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত।”^{১৯} এইভাবে তিনি একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন, চিত্তশুদ্ধি হল হিন্দু ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ, শুধুমাত্র তাই নয়, সেই চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, অনীশ্বরবাদী সকলের কাছে শ্রেষ্ঠধর্ম, কেননা গোষ্ঠীগত ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন সব কিছুর ভিত্তি হল সেই চিত্তশুদ্ধি।

আবার, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র গীতোক্ত চতুর্থ অধ্যায়ের ১১নং শ্লোক ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত করে বলেছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাং স্তুথৈব ভজাম্যহম।

মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যঃ পার্থ সর্ব্বশা।।”^{২০}

এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন - “এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে পৃথিবীতে আর ধর্মগত পার্থক্য থাকে না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক - যে পথে তিনি আছেন সে পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকে উক্ত ধর্মই জগতের একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। একমাত্র সর্বজন অবলম্বনীয় ধর্ম। ইহাও প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই - আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।”^{২১}

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমেই হয়ে ওঠেন রক্ষণশীল, পশ্চাৎমুখী, হিন্দুত্ববাদী। তিনি নবরূপে হিন্দুধর্মকেই জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম বলে দাবী করেন, যদিও তাঁর ধর্মতত্ত্ব ছিল শশধর তর্কচূড়ামণি জাতীয় প্রচলিত হিন্দু গোঁড়ামির থেকে পৃথক। ধর্মতত্ত্বে অনুশীলন প্রবন্ধে তিনি তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত ‘অনুশীলন’ প্রবন্ধে তিনি বলেন - “ধর্ম যদি সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না। এজন্য এছাড়া অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরলোক লইয়া ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগত - সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে?”^{২২} সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন জগতে হিন্দুধর্ম হল শ্রেষ্ঠধর্ম। তবে এই ধর্ম অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম, সনাতন হিন্দুধর্ম নয়। তিনি মুসলিম ধর্মাবলম্বী কছিখাদী শেখকে দিয়ে দুর্গাপূজা করার সংকল্প করেছিলেন; এবং তিনি হিন্দুধর্মের বোকামিগুলি মানতে চান নি। এই নব হিন্দুধর্মের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য বেশী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্মের পুরানো অর্থ আর এখন সত্য ধর্ম এক নয়। তাঁর এই ধর্মে অলৌকিকতার কোন স্থান নেই। সেজন্য তিনি মনে করেন উপনিষদীয় একবাদ ‘অতিবিশুদ্ধ’ হলেও তা অসম্পূর্ণ’ বিশুদ্ধ একবাদ এবং ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদ - উভয়ের সহাবস্থানে তিনি ঈশ্বর চেতনার সম্পূর্ণতার সন্ধান পেয়েছেন। সেজন্য তিনি বলেছেন “শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের

আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ।দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহাতে হিন্দুধর্মের অবনতি এবং হিন্দু জাতির অবনতি ঘটিয়াছে।”^{২০}

বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষ বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ, তাই এমন একটি ধর্ম প্রচার করা আবশ্যিক যা অসাম্প্রদায়িক, সার্বভৌমিক এবং সার্বজনীন। জলের যেমন কোন রং নেই, ঈশ্বরের কোন জাতি নেই। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানোর অনেক পথ আছে। কেউ কেউ পথকে বড় করে দেখেন সেজন্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ডি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি সাকারবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি অপচারকে অস্বীকার করেছেন, লোক বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও কোন মানুষকে দেবতার অংশ হিসাবে ভজন করার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে এটি পরধর্মের প্রতি বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে তিনি খ্রীষ্টধর্মের সংকীর্ণতা ও ইসলাম ধর্মের পরধর্ম বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধিকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতেন না। বৈদিক যাগযজ্ঞকে তিনি ত্যাগ করেছেন এবং শাস্ত্র উক্তিকে ধর্মের ব্যাখ্যা হিসাবে বিচার করেছেন, ধর্ম বলে শিরোধার্য করেন নি।

অসাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সার্বজনীন বৃত্তির সন্ধান করেছেন। এটি তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসার মূল কথা। তিনি দেখিয়েছেন সকল মানুষই সুখের সন্ধান করে। সকল দেশে সকল অবস্থায় এই অন্বেষণ মানুষের মনকে বিচলিত করে থাকে। যা সবাই খুঁজে চলেছে, অথচ কেউ তাঁকে লাভ করতে পারছে না, তাঁর সন্ধান করতে পারলেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কৃত হবে। ধর্ম তাকেই বলে যাকে অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন সব মানুষই সুখ কামনা করে কিন্তু কেউই তা পায় না। কেউই নিশ্চিত করে জানে না যে, সে কিসে সুখী হতে পারে। সেজন্য ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই তিনি প্রশ্ন করেছেন দুঃখ কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সুখ কি? ঊনবিংশ শতকের হিতবাদীরা (Utilitarianist) ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক কল্যাণের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের (Greatest good for the greatest number) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা ব্যক্তির সুখ এবং সামাজিক মঙ্গলের মধ্যে কোন সংযোগ আছে তা প্রমাণ করতে সমর্থ হন নি। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন মানুষের সুখ মনুষ্যত্ব বিকাশে; বৃত্তির স্ফূর্তি আর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এক হলেই সুখ। সামঞ্জস্যই সুখ। যার দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তির অনুশীলন হয় তা হল সুখ। শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশই হল মনুষ্যত্ব। এটি হল মানুষের সুখ ও ধর্ম। সুখ ও দুঃখের কোন বিশিষ্ট সত্তা নেই। এটি মনের বিশিষ্ট অবস্থা মাত্র। আত্মার এমন অনুশীলন করতে হবে মঙ্গলময় কার্যই রুচিকর হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হলেই আত্মার চরম পরিণতি সম্ভব। এই অনাসক্তি লাভ করতে পারেন ভক্তিমান জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি সকল সুখের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাঁর সীমা দেখতে পেরেছেন। যিনি সকল স্বার্থ ঈশ্বরের কাছে বিসর্জন দিতে পেরেছেন। ঈশ্বরের এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান উভয়ের চরম অবস্থা হল নিকাম কর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় লৌকিক আচার, যাগযজ্ঞের, অলৌকিকতার কোন স্থান নেই। তিনি সর্বজনীন ধর্মের সন্ধান করেছেন। ধর্মকে তিনি মানুষের একেবারে স্থূলতম দৈহিক ভাবনার উপর স্থাপন করে জিজ্ঞাসাকে ক্রমেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে তুলেছেন। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত পদ্ধতিকে জ্যামিতিক পদ্ধতি বলে অ্যাখ্যায়িত করা চলে। দৈহিক বৃত্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ - এর থেকে তিনি নতুন সিদ্ধান্তগুলিকে নিঃসৃত করেছেন। এই নিয়মের উপর ভিত্তি করেই তিনি ব্যক্তিগত সুখ দুঃখবোধ থেকে শুরু করে সমাজ দেশ, বিশ্বকে একটি সুসংহত ছকের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। তবে সবার উপরে তিনি ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঈশ্বর হলেন নৈব্যক্তিক - ঈশ্বর প্রীতির কোন অন্য মূল্য এক্ষেত্রে স্বীকার করা যায় না। তাঁর এই পদ্ধতি হল স্কলাস্টিক পদ্ধতির বিপরীত। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যাত্মবাদীদের দিকে না ঝুঁকে প্রয়োজনবাদীদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাই তিনি কোন বিশিষ্ট ধর্মকে বৃহৎ করে প্রকাশ করেন নি। কারণ এই সকল আচার অনুষ্ঠান হল কাম্য কর্ম। পুণ্যলোভী ব্যক্তির স্বর্গলাভের আশায় এই জাতীয় কার্য সম্পাদন করেন। প্রকৃত ধর্ম হল ভক্তি ও জ্ঞানের ধর্ম, যা মানুষকে অনাসক্ত ও যোগস্থ করে। তবে ভক্তি ও জ্ঞানকে বড় করে দেখলেও ধর্ম সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভক্তি বৈরাগ্যের প্রশয় দেয়। জ্ঞান কর্মের মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু কর্ম করার প্রেরণা যোগাতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র দাবী করেন প্রেরণা আসে স্বধর্ম থেকে। এই ‘স্বধর্ম’ শব্দটি গীতায় উল্লিখিত হয়েছে এবং হিন্দুধর্মে চারবর্ণের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। তিনি স্বধর্মের একটি অভিনব সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, কারণ তাঁর মতে প্রকৃত ধর্ম হল সর্বজনীন এবং অসাম্প্রদায়িক। তাঁর মতে যে সমাজে ও যে কালে ব্যক্তি জন্মেছে তার সেই সমাজের ও কালের উপযোগী কতকগুলি কর্ম আছে - তাই হল স্বধর্ম এবং জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে এই স্বধর্ম তাঁকে অনুষ্ঠিত করতে হবে। স্বধর্মের স্বরূপ

নির্ভর করে সমাজের অবস্থার উপর।^{১৪} তাই ধর্মের সম্যক অনুষ্ঠানের জন্য বর্হিবিসয়ক জ্ঞান লাভ করা বিশেষভাবে আবশ্যিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের এমন কতকগুলি মাপকাঠি খুঁজে বের করতে চেয়েছেন যা সকল দেশে সকল কালে এবং সকল লোকের উপর প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেন, সকল কর্মকে ঈশ্বরের আদৃষ্ট বলে মনে করতে হবে। ঈশ্বরের ভক্তিই অনুশীলনের নিয়ামক হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর কোন আকাশ বিহারী দেবতামাত্র নয়, তিনি (ঈশ্বর) নিখিল বিশ্বের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করেছেন - সকল মানবের চেতনার মধ্যে তিনি বিরাজমান। সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তি পরিপূর্ণ হলে সেই ভক্তি লোকপ্ৰীতি, দেশসেবা ও জীবে দয়ায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর প্রতিভার শেষ পর্যায় পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় স্বাদেশিকতা ও অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্যক স্মৃতি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই হল মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য এবং মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। শ্রীকৃষ্ণ হলেন অনুশীলন ধর্মের আদর্শ।

কাজেই তাঁর মতে, ধর্ম কোন নির্জন উপলব্ধির বিষয়মাত্র নয়। ধর্মের দুই দিক - বৈরাগ্য সাধন বা মুক্তিচর্চা এবং লৌকিক দেবার্চনা। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শই বঙ্কিমচন্দ্র কল্পিত ধর্মে স্থান লাভ করতে পারে নি। তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য। ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম একদেশদর্শী - তা মানুষের ভাববিনাশী। তা মানুষকে নিজীব, নিবীর্ঘ্য করে দেয়। জ্ঞানাত্মক ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় সাংখ্য দর্শনে এবং ইউরোপীয় পজিটিভিজম এবং বিজ্ঞানচর্চায়। কেবল্যালাভে প্রয়াসী সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি হল অর্ন্তবিষয়ক জ্ঞান। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বর্হিবিসয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধান করে তবে উভয় প্রকার ধর্মই ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে। তাই উভয় চিন্তাই অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন শ্রেণীর ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। তিনি হলেন হিতবাদী। তবে তাঁর এই হিতবাদের মূলে রয়েছে সর্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস। তিনি মনে করেন জ্ঞান ও কর্মের পরিণতি ঘটে ভক্তিতে। আবার কর্ম ও ভক্তির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে জ্ঞান। যেখানে এই যোগসূত্রের অভাব ঘটলে সেখানে ভক্তি হয়ে ওঠে নিজীব আর কর্মও তুচ্ছ সংকীর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। এই সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মের বিকাশ ঘটেছে গীতায় এবং এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক হলেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতা হিন্দুর ধর্ম এবং কৃষ্ণ হলেন হিন্দু - এই হিসাবেই এবং কেবলমাত্র এই হিসাবেই হিন্দু ধর্ম হল শ্রেষ্ঠধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মে কোন সংকীর্ণতা নাই - এটি সর্বদেশে সর্বকালে প্রযোজ্য। তবে সমালোচকগণ এই দাবী সমর্থন করেন না। তাঁকে সংকীর্ণতাবাদী, হিন্দুত্ববাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বলে দাবী করে থাকেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও স্বীকার করে ছিলেন যে, তাঁর নব ব্যাখ্যাত ধর্মকে কোনও হিন্দু ধর্ম বলে মেনে নিতে সমর্থ হবেন না।

তাছাড়া তিনি মনে করেন ধর্ম হল সুসামঞ্জস্য অনুশীলন। তিনি ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও দেশসেবা তথা দেশপ্রেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তখন রায়চৌধুরী বলেছেন, "There are two distinct phases in the development of Bankim's patriotic and ideological concerns and a corresponding change in his evaluation of the West. The distinction between the two phases is sharp and somewhat sudden."^{১৫} তত্ত্বের মধ্যে সমাজসেবা এবং দেশপ্রেমকে এককথায় জীবনের দায়দায়িত্বকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারা উপলব্ধি করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম বাস্তব জীবনধারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি সত্যকে জীবনের সবক্ষেত্রে দেখতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি একথা জানতেন যে পরিপূর্ণ বা আদর্শ সামঞ্জস্য স্থাপন করা কখনোই সম্ভব নয়। তবে অসম্ভব হলেও সেই আদর্শকে আয়ত্ত করার চেষ্টাতেই মনুষ্যত্বের সাধনা ও বিকাশ। সবকিছু মধ্য দিয়ে তিনি একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রশ্ন, সংশয় ও বিশ্বাস - এই ত্রয়ীর মেলবন্ধন ঘটানো একটি কঠিন কাজ। বঙ্কিম ভাবনায় রয়েছে যুক্তিবাদ, আছে প্রশ্ন, সংশয়, বিশ্লেষণ, আবার রয়েছে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াও, সর্বোপরি রয়েছে বিশ্বাস। সমগ্র বঙ্কিমী মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আধুনিক চেতনার যোগ। আমরা বার বার নিজ নিজ মননশীলতার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি মাত্র। ধর্মতত্ত্ব তাঁর যুগের শাস্ত্র, জীবনকে স্বীকার করেই তাঁর মনীষার পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর অভিনবত্ব, তাঁর মহত্ব।

তথ্যসূত্র:

- ১) Bankimchandra Essay in perpectives (Ed), Bhavatosh Chatterjee, Bankimchandra: His continuing relevance, Gopal Halder, Sahitya akademy, New Delhi, 1st published 1994 Page 147
- ২) বঙ্কিম রচনাবলী (২ খন্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ১৪৪

- ৩) Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteen Century Bengal, Oxford University press, Tapan Roy Choudhuri, New Delhi, Chapter 3, Page - 125
- ৪) বঙ্কিম রচনাবলী (২ খন্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ১৩৬
- ৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৫১
- ৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭৭
- ৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭৮
- ৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭৮
- ৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭৮
- ১০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭৯
- ১১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২২০
- ১২) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০
- ১৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২১৮
- ১৪) বঙ্কিম মনীষা, ভবতোষ দত্ত, সমকালীন, সপ্তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৬
- ১৫) বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী এন্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৪
- ১৬) বঙ্কিম রচনাবলী (২ খন্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ৬২২
- ১৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫৮
- ১৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫৯
- ১৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৯৬
- ২০) ভগবতগীতা, গিরিন্দ্র শেখর বসু, (শ্লোক ৪/১১) পার্সিবাগান লেন থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৯
- ২১) বঙ্কিম রচনাবলী (২ খন্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯, দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ৭৭০
- ২২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৯৬
- ২৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৮১৬
- ২৪) বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৮
- ২৫) Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteen Century Bengal, Tapan Roy Choudhuri, Oxford University press, New Delhi, Chapter 3, Page 137